

বৈষ্ণবোদবৌ

মাতা বৈষ্ণবোদবৌ মন্দরি □

মাতা বৈষ্ণবোদবৌ গুহা মন্দরি ভারতের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রয়াসি জেলার কাটরা থেকে ১২ কিলোমিটারে ত্রিকুট পাহাড়ে ৫২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই মন্দরিটি বিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসাবে পরিচিত। বৈষ্ণবোদবৌ মন্দরি হল দবৌ দূর্গাকে উৎসর্গ করা বখিয়াত হিন্দু মন্দরি। সারা বিশ্ব থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই বখিয়াত ধর্মীয় স্থানটি পরিদর্শন করে যখনে মাতা বৈষ্ণবোদবৌ তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। স্থানীয় ও ভক্তদের বিশ্বাস, এখনো পর্যন্ত এই মন্দরিকে ঘিরে রয়েছে এক শক্তিশালী পজটিভি এনার্জি প্রতি বছর এক কোটিও বেশি ভক্ত বৈষ্ণবোদবৌ মন্দরিতে যান দবৌর পূজা দেওয়ার জন্য। মানুষের ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি সবসময় সমাদৃত। তাই, ভক্তরা তাকে ‘মুহ মাঙ্গি মুরাদনি পুরি করনে ওয়ালি মাতা’ বলেও সম্বোধন করে যার অর্থ যে মা তার সন্তানদের ইচ্ছা পূরণ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস দবৌ স্বয়ং ভক্তদের এখানে পেঁছানোর জন্য ডাকেন। তাই, স্থানীয়রা প্রায়শই “মা আপ বুলান্দি” বলেন, যার অর্থ মা ডাকো।

মাতা বৈষ্ণবোদবৌ গুহায় দবৌ সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট শিলা আকারে আছেন যার তিনটি মাথা বা পন্ডি রয়েছে। দবৌ মাতার প্রতীক তিনটি পন্ডি মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী নামে তিনটি দবৌকে উৎসর্গীকৃত। ডানদিকের পন্ডিটি দবৌ মহাকালীকে উৎসর্গীকৃত, যা কালো রঙের। কালো রঙ মহাকালীর নামের সাথে যুক্ত এবং তাকে মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্যময় এবং অজানা শক্তির একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তিনি তার ভক্তদের অন্ধকারের বাহনিকে জয় করতে সক্ষম করেন। মাঝখানে অবস্থিত দ্বিতীয় পন্ডিটি দবৌ মহালক্ষ্মীর পবিত্র পন্ডি। এটি পীতাম্বর বা সোনালি হলুদ বর্ণের, যা দবৌ লক্ষ্মীর রঙ। তিনি রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোচ্চ শক্তি এবং অনুপ্রেরণার পাশাপাশি প্রচেষ্টার গুণে রজো গুণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাকে সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং বস্তুগত লাভের একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তৃতীয় এবং শেষ পন্ডি, যা বাম দিকে অবস্থিত, মাতা মহা সরস্বতী হিসাবে পূজিত হয়। তিনি সত্য গুণের প্রতিনিধিত্বকারী সৃষ্টির সর্বোচ্চ শক্তি বলে মনে করা হয়। মহা সরস্বতীর এই পন্ডি সাদা রঙের। তাকে সৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিল্প এবং ধার্মিকতার মৌলিক উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মাতা বৈষ্ণবোদবৌ তীর্থক্ষেত্রে ভক্তরা চূনরি (একটি লাল রঙের চাদর), শাড়ি, শূকনো ফল, রটোপ বা সোনার অলঙ্কার, ছোলা, ফুল ইত্যাদি মাতাকে ঐতিহ্যবাহী নৈবেদ্য দেয়। বৈষ্ণবোদবৌ পূজার কারণেই নয়, দিন ধরে নবরাত্রি পালন করা হয়, দশেজুড়ে।

হিন্দু ধর্ম মতে আদি শক্তি দবৌ মা র অবতার বৈষ্ণবোদবৌ। অসুরদের অত্যাচারের অবসান ঘটাতে বৈষ্ণবোদবৌ আবরিভূত হন। বৈষ্ণবোদবৌ ধার্মিকতা বজায় রাখার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা বৈষ্ণবোদবৌ পরম বৈষ্ণবী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দবৌগণ তাকে পৃথিবীতে বসবাস করতে এবং চতেনার উচ্চ স্তর অর্জনের জন্য তার সময় ব্যয় করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবীতে তার আগমন রত্নাকরের কন্যা হিসেবে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, বৈষ্ণবোদবৌ ভারতের অর্ধা কুনওয়ারি, কাটরা শহর এবং গুহার মধ্যবর্তী একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রত্নাকর সাগর এবং তাঁর স্ত্রী ব্যিরে পর নগিসন্তান ছিলেন। দীর্ঘদিন সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। অবশেষে তাঁদের কোলে জন্ম নেয় এক কন্যাসন্তান। এই কন্যাসন্তানের জন্মের পরেই তাঁরা শপথ নিয়েছিলেন যে সন্তানের ভবিষ্যতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপে করবেন না তাঁরা। বৈষ্ণবোদবৌর ছোটবেলা নাম ত্রিকুট ছিল। পরে ভগবান বষ্ণু বংশে জন্ম নেওয়ায় তাঁর নাম বৈষ্ণো হয়। তিনি ছিলেন ভগবান বষ্ণুর প্রবল ভক্ত। মাতার নয় বছর বয়সে ভগবান বষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য সে পিতার অনুমতিনিয়মে সমুদ্র ধারে তপস্যা করতে শুরু করেন। বৈষ্ণবোদবৌ আধ্যাত্মিকপ্রবণ ছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করে

বছর কাটিয়েছিলেন। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বৈষ্ণু অবতার শ্রীরাম রূপে আশীর্বাদও করেন বৈষ্ণোদেবীকে।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল রামায়ণের সময়, যখন লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণ শ্রীরামের পত্নী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সীতার খোঁজে আত্মহারা শ্রীরাম। শ্রীরাম যখন সীতার সন্ধানে সমুদ্রে ধারে এসে সবে সময় দেখে এক মহিলা তপস্যা করছে। বৈষ্ণোদেবী শ্রীরামকে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু যাহেতু শ্রীরাম তিনি ইতিমধ্যেই সীতার সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন, তাই শ্রীরাম বনিয়ে সঙ্গে জানান এই অবতারে তিনি কেবল সীতার জন্য নিষ্ठाবানরে জন্য কথা দিয়েছেন। শ্রীরাম তাঁকে কল্যাণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে তাঁকে কথা দেন কল্যাণে কলকি অবতারে তাঁকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবেন। শ্রীরাম তাঁকে ত্রিকুটা পাহাড়ের গুহায় একটি আশ্রম স্থাপন, ধ্যান ও আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে নির্দেশ দেন এবং সেখানে তাঁর নরীপতার জন্য শ্রীরাম একটি সিংহ, হনুমান ও তীর-ধনুক দেন। এরপর থেকেই শ্রীরামের নির্দেশে বৈষ্ণোদেবী ত্রিকুটাতে একটি গুহার মধ্যে থাকতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবী সাধবী হিসাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন এবং তপস্যা চালিয়ে যান।

যখন দেবী কাটারার ত্রিকুটা পাহাড়ে থাকতে শুরু করেন, তখন মহাযোগী গুরু গোরক্‌নাথজি, যিনি জানতেন যে বৈষ্ণোদেবী এবং শ্রীরামের মধ্যে কী ঘটেছিল, তিনি তাঁর শিষ্য ভৈরবনাথকে দেখার জন্য করতে পাঠান যে তপস্বী বৈষ্ণোদেবী এখনও আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন কিনা। তাকে দেখে সন্তোদর্যে মুগ্ধ হয়ে ভৈরবনাথ ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যবোধ হারিয়ে ফেলেন এবং তার প্রমেতে পড়েন এবং তাকে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে বরিত্ত করতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবীকে দেখে ভৈরবনাথ তার প্রতি কামনা করে ধরতে তার পছিনে দৌড়েছিলেন এবং বৈষ্ণোদেবী তার তপস্যা/ধ্যান অবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিকুটা পাহাড়ের পথে বিভিন্ন স্থানে থেমে পালিয়ে যান। স্থানগুলি এখন বঙ্গগা (তীর থেকে গঙ্গা নদী উদ্ভূত), চরণপাদুকা (পবিত্র পায়ে ছাপ), অর্ধকুনওয়ারী নামে পরিচিত।

ভৈরবনাথ যখন বৈষ্ণোদেবীকে ধরতে তার পছিনে দৌড়েছিলেন। বৈষ্ণোদেবী কে রক্ষা করার জন্য পবনপুত্র হনুমান ছিল। হনুমান সঙ্গে ভৈরবনাথের সংঘর্ষ হয় কিন্তু ভৈরবনাথ তার পছিনে যেতে থাকে। বৈষ্ণোদেবী পাহাড়ের একটি গুহার কাছে পৌঁছে ভৈরবনাথকে ফিরে যেতে বলেন কিন্তু ভৈরবনাথ ফিরে যেতে রাজি নয়। তখন বৈষ্ণোদেবী গুহার কাছে হনুমানকে ডেকে বলেন যে, আমি এই গুহায় নয় মাস তপস্যা করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আপন ভৈরবনাথকে গুহায় প্রবেশ করতে দেবেন না। এরপর বৈষ্ণোদেবী গুহায় প্রবেশ করে তিনি ৯ মাস ধরে গুহায় ধ্যান করছিলেন ঠিক যেভাবে একটি শিশু তার মায়ের গর্ভে ৯ মাস থাকে। হনুমান মায়ের আদেশ পালন করেন। ভৈরবনাথকে এই গুহার বাইরে রাখা হয়েছিল। এই পবিত্র গুহাটিই 'অর্ধ কুনওয়ারী' নামে পরিচিত।

ভৈরবনাথের উন্মত্ততা দেখে অবশেষে ভবনে, যে গুহাটি বৈষ্ণোদেবীর বাড়ি হিসাবে পরিচিত সেখানে তিনি দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করে ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবনাথের শরীর থেকে মাথা কটে আলাদা করে সংহার করে দেন। ভৈরবনাথের দেহ গুহার প্রবেশদ্বারে ছিল, বিশ্বাস করা হয় যে এই গুহাটি ভৈরবনাথের দেহ সংরক্ষণ করে। ত্রিশূল দিয়ে শরিচ্ছদের কারণে ভৈরবনাথের মাথা পাহাড়ের আরও উপরে একটি জায়গায় পড়ে যেখানে ভৈরবনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছে। কথিত আছে, দেবী যখন ভৈরবনাথ বধ করে তখন ভৈরবনাথ তার ভুল বুঝতে পরেছিলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমার প্রার্থনা করে। শেষ পর্যন্ত, দেবী যখন বৈষ্ণোদেবী রূপে ফিরে আসেন, তখন বৈষ্ণোদেবী তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি, তাকে বরও দিয়ে বলেন যে, আমার দর্শন ততক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ না তোমার মাথার দর্শন হয় এবং তাকে তার মন্দির রক্ষা করতে বলেন। তাই বিশ্বাস করা হয় যে, ভৈরবনাথের মন্দির দর্শন ছাড়া বৈষ্ণোদেবীর যাত্রা অসম্পূর্ণ। অবশেষে, বৈষ্ণোদেবী তিনি ছোট শিলা (পিন্ডি) আকারে উদ্ভাসিত হয়ে মাতা বৈষ্ণোদেবী নামে পূজিত হন এবং এখনও পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। আর এই কথাও প্রচলিত আছে যে মাতা বৈষ্ণোদেবী কল্যাণের সমস্যাতে নিজের সন্তানদের মতো রক্ষা করেছেন।

মহাভারত, যা পাণ্ডবদের এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ দেয়, দেবী বৈষ্ণোদেবীর পূজার

উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পাণ্ডব এবং কৌরবদেবের সেনাবাহিনী সাজানো হয়েছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন যুদ্ধে বজ্রের আশীর্বাদের জন্য দেবীর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর ভক্তিতে খুশি হয়ে মাতা বৈষ্ণোদেবী রূপে তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। যখন দেবী আবির্ভূত হন, তখন অর্জুন একটি স্তোত্র দিয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করেন, যখনে একটি শ্লোক বলে যায়, 'যমবৃকতক চতুষ্টয়মু নতিযম সন্নহিতালয়ো', যার অর্থ 'আপনি যিনি সর্বদা জন্মভূতে পাহাড়ের ঢালে মন্দিরে বাস করেন' □ যা সম্ভবত বর্তমান জন্মকে বোঝায়। কথিত আছে, পাণ্ডবরাই সর্বপ্রথম কোল কান্দোলি এবং ভবনে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন মাতৃদেবীর প্রতিশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়। একটি পাহাড়ে, ত্রিকুটা পর্বতের ঠিক সংলগ্ন এবং পবিত্র গুহা উপেক্ষা করে পাঁচটি পাথরের কাঠামো রয়েছে, যা পাঁচটি পাণ্ডবের শিলা প্রতীক বলে মনে করা হয়।

পট্টাচল কথ্য অনুসারে আজ থেকে প্রায় নয়শ বছর আগে কাটারার পার্শ্ববর্তী হানসালি গ্রামে পাণ্ডিত্য শ্রীধর ছিলেন আদিশক্তির পরম ভক্ত। মা শক্তির অনন্য ভক্তকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন □ শ্রীধর। আগামীকাল পূর্ণিমা তিথিতে পাহাড়ের পাদদেশে আশপাশের সব গ্রামের লোকদের জন্য তোমার গৃহে অন্ন প্রসাদের আয়োজন কর। এত লোকের খাবারের আয়োজন কভাবে হবে তা ভবে হতদরদ্র শ্রীধর ভাবক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তবুও তিনি জগৎ মাতার আদেশে সবাইকে নমিত্রন করে এলেন।

পরদিন পূর্ণিমার উষা লগ্নে

□ কে আছে গো বাড়ীতে ?

ডুরে শাড়ি পড়া পরমা সুন্দরী এক কুমারীকে দেখে শ্রীধর জিজ্ঞাসা করলেন,

□ কী নাম তোমার বাছা।

□ বৈষ্ণোবী। শুনছি মা শক্তির আদেশে আপনার বাড়ীতে মহাভোজের আয়োজন হচ্ছে। □

ভাবছি এত লোকের খাবারের আয়োজন হবে কভাবে ?

□ কেনে অথবা ভাবছেন মায়ের কাজ মা'ই উঠিয়ে নেবেন।

আদিশক্তি দেবী মার স্বপ্নাদেশের পূর্ণতার শরীক হতে আশপাশের সব গ্রামের লোক নজি নজি ক্ষেত্রে চাল, ডাল, আনাজ নিয়ে এসে ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নমিত্রত্বের সঙ্গে ডুরে শাড়ি পড়া মেয়েটিকে কুটিরের একটি ফাঁকা স্থান দেখে বসল। এদিকে যতটুকু সামগ্রী রয়েছে ততটুকু দিয়েই অতিথি আপ্যায়ণ করতে শুরু করলেন শ্রীধর। মেয়েটিও হাত লাগাল পরিশ্রমে। দেখা গেলে যে খাবার কম হবে বলে রাত্রে ঘুম উড়ছে শ্রীধরের, সেই খাবার কম তো হলই না, বরং বঁচে গেল। পূর্ণিমার দিন হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ তৃপ্তির মহাপ্রসাদে মত্তে রইল।

অনুষ্ঠান শেষে শ্রীধর মেয়েটিকে খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু কোথায় সেই ছোট মেয়ে ! বিস্মিত শ্রীধর বুঝলেন এ সবই মা শক্তির অলৌকিক কৃপার ফল। তিনি মা শক্তির নরিবছিন্ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। গভীর ধ্যানের মাঝে তিনি দেখলেন কটে তাঁকে পথ দেখিয়ে একটা গুহায় নিয়ে গেছে। গুহার মধ্যে তিনি গিলাকার পাথর যাঁর অর্ধেকটা জলের গভীরে ডোবানো। নমিষেমাত্র তিনি কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর অবয়ব প্রত্যক্ষ করলেন। আদিশক্তির প্রকাশ ত্রিদেবীরূপে সত্বগুণে মহাসরস্বতী, রজোগুণে মহালক্ষ্মী ও তমোগুণে মহাকালী।

কিছুদিন পরে শ্রীধরের স্বপ্নে মেয়েটি ফিরে এল। জানালেন ভক্তের ভক্তিদেখে তিনি তুষ্ট হয়ে মায়ের রূপে শ্রীধরকে সাহায্য করে গিয়েছিলেন স্বয়ং বৈষ্ণোদেবী। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন কোন গুহার মধ্যে তাঁর মন্দির গড়বেন ভক্ত।

দেবী আদেশানুযায়ী গুহা খুঁজে সেখানে শ্রীধর নির্মাণ করেন বৈষ্ণোদেবী মন্দির। শ্রীধর গুহায় এই মন্দিরে দেবী শক্তির অনুপম ত্রিটি রূপ কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ত্রিটি পিন্ডি মাতা বৈষ্ণোদেবী নামে পূজা করা শুরু করেছিলেন এবং শ্রীধরের বংশধররা আজও তা করে চলছেন। জয়. মাতা দী।

জয়. মা বৈষ্ণোদেবী

(সংগৃহীত)

